"নুরু মিয়া"

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

প্রায় একযুগ আগের কথা যখন বসুন্ধরার বুকে কুঁড়ি হয়ে ফুঠেছি। বিদ্যলয়ে গমন বা নব বর্নমালা আয়ত্বে এনে শব্দ গঠন করতে পারি। সে সময় শুধুমাত্র, বাংলা ইংরেজী বর্নমালা দিয়ে বাক্য গঠন করার মাঝেই বিদ্যা অর্জন সীমাবদ্ধ থাকত না তার স্বার্থক ব্যাবহারের পাশাপাশি আরবি হরফ শুদ্ধভাবে উচ্চারন করে কোরআন তেলাওয়াত করা বাধ্যতামুলক ছিল। এখন অবশ্য তেমনটা বাধ্যবাদকতা নাই। কষে দু' চার লাইন ইংরেজী কবিতা আওড়াতে পারলেই শ্রদ্ধেয় অভিভাবক মশায়দের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে এই জন্য যে নব আলো সন্ধানকারীর দল অন্ততঃ রুজী রোজগারের একটা পথ বেশ ভলোভাবেই করতে পারবে। পরকালের সন্ধান নাই বা করল, ইহলোকে বেঁচে থাকাই চরম স্বার্থকতা। পরকাল অনেক দূরে সেখানে যা হয় হোক।

ইংরেজী ভাষার প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শন করা আমার অভিপ্রায় নয় বা আমি তার বিরুদ্ধে ও যেতে চাই না। সভ্যতার বিকাশে মাতৃভাষার মর্যাদা অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। আর ধার্মিক ভাষা? সেটাতো এখন বাস্তব জীবনে প্রয়োগের অধিকার ও রাখেনা। শুধু তা জন্ম এবং মৃত অবস্থায় কার্যকর। রোজগারের জন্য ইংরেজী ভাষাইতো প্রধান হাতিয়ার। সারা দুনিয়া যেদিকে চলবে আমরা তার বিপরীত দিকে চলে পশ্চাতে পড়ে থাকব কেন। তাই হয়তোবা মাতৃভাষা এবং ধার্মিক ভাষা ব্যাবহারের প্রবণতা অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। সে সব থাক্ এর চুড়ান্ত মীমাংসা করা আমার কাজ নয়। যে যেভাবে পারুক, সেভাবেই বাঁচুক।

যা বলছিলাম এই তিনটি ভাষা একত্রে আনতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর দলই বেশ মুশকিলে পড়ত। একে তো স্কুলের গুরুমশায়দের বেত্রাগাত অন্যদিকে হুজুরের চোখ রাঙানী। এই সমস্ত অত্যাচার সইতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থীই বিদ্যার্জন ছেড়ে দিয়ে এখন কল্সে ভাঙার জলকে আশীর্বাদ হিসেবে নিয়ে দিনাতিপাত করছে। কেউ কেউ সেখানে মাছ ধরে আবার কেউ কেউ ক্ষেতে খামারে কর্মব্যাস্ত। তবে কেউ কেউ মাটি কামড়ে ছিল বলেই কিছু আয়ত্বে আনতে পেরেছে বা এখন ও গলধঃকরন করে যাচ্ছে। আমি ও শেষোক্ত পর্যায়ের দলে।

আমাদের বাড়ীর আঙিনায় একপ্রান্তে সাবেকী আমলের এক পুরাতন মক্তবখানা ছিল। আমার পিতামহ নিজ হাতে গড়েছিলেন। তিনি গত হয়েছেন কিন্তু সাক্ষী হিসাবে মক্তবখানা এখন ও টিকে আছে। সেই মক্তবখানায় আমার শ্রদ্ধেয় পিতাজান ধর্ম শিক্ষার ব্যাবস্তা করেছিলেন এবং সেখানকার ওস্তাদ ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মসজিদের ইমাম জনাব নসরুল্লাহ্। আমরা বিদ্যালয়ের পাঠ পর্ব সমাপ্ত করে অপরাহ্নকালে হুজুরের কঠোর তত্বাবধানে দল বেধে আলিফ- বা - তা - ছা ধ্বনীগুলো কণ্ঠে ধারণ করে এমন চীৎকার করতাম যে মনে হতো এই বুঝি আমাদের কণ্ঠের আওয়াজে নড়বড়ে মক্তবখানা ভেঙে পড়ল। কিন্তু পড়ি পড়ি করে ও পড়েনা আর

আমাদেরও ক্ষেত্র অভাবে অন্ততঃ একটা পাঠে বিঘ্ন ঘটেনা। যদি সত্য সত্যই বিঘ্ন ঘটত তবে আমি হল্‌ফ করে বলতে পারি শতকরা নব্বই জন শিক্ষার্থীই খুশী হত।

একদিন অপরাহ্নকালে আমরা সকলেই জ্ঞান সাধনায় ব্যাস্ত ঠিক তেমনি সময় ঘটে গেল এক অবাক কান্ড। আমাদের পাড়ার নুরু মিয়া চল্লিশোর্ধ বয়সে আমপারা হাতে নিয়ে মক্তবখানার সামনে এসে হাজির হল। তার এই অভাবনীয় কান্ড দেখে আমরা সকলেই একে অপরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছি। সেদিকে নুরু মিয়ার কোন খেয়ালই নাই। বোধকরি বাল্যকালে শিখতে পারে নাই বলে এ বয়সে তার কুফল বুঝতে পেরে একেবারে বালকদিগের সাথে ও মিশে যেতে কুণ্ঠাবোধ করছেনা। এই তত্বকথাটুকু আমাদের বুঝবার বয়স না হলে ও হুজুরের হয়েছিল বলেই তিনি নুরু মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন –আরে নুরু ভাই, পড়তে এসেছ বুঝি?

প্রতি উত্তরে শুধুমাত্র মাথাটা এদিক ওদিক দুলিয়েই ঝুপ করে বসে পড়ল। কেউ কোন বাক্য প্রয়োগ করলো না। কিন্তু আমি সইতে পারলাম না। কারণ এই যে ছোটকাল থেকেই পড়ালেখায় কিছুটা ফাঁকি দেবার পথ বের করতে পারলে আমি সে পথের স্বার্থক ব্যাবহার করতাম। অবশ্য, সঙ্গী হিসেবে আর ও দু' তিনজন ছিল। বলতে গেলে ওদের সবার সর্দ্দার ও ছিলাম আমি। কোন একটা গোল পাকাইতে পারলে আর ছাড়তামনা। বাবার তত্বাবধানে মক্তবখানা সেই সূত্র ধরে পরবর্তী উল্টরাধীকার হিসাবে আমার জোর কম নয়। বলা চলে ওস্তাদের চেয়ে বেশি কারণ ওস্তাদের ছিল চাকরির ভয় আর আমার বেত্রাঘাত। পিঠের জ্বালার চেয়ে পেটের জ্বালা কম নয়। বরঞ্চ বেশি। তাই ওস্তাদ আমাকে কিছুটা সমীহ করতেন।

নুরু মিয়া বসে পড়ার সংগে সংগে আমার ফাঁকি দেবার পথ বের হয়ে গেল। আমি আমপারা গুছিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে যেতে লাগলাম। খানিকটা পথ যাবার পর হুজুর আমাকে ধরে ফেললেন। তারপর আমি না বলে চলে যাচ্ছি কেন তা জানার নিমিত্তে আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি ঝন্ ঝন্ করে বলে উঠলাম – আমি ওর সাথে পড়ব না। অবাধ্য বালককে মন্ত্র দিয়ে না বেঁধে মন্ত্রবলে বাঁধাই বোধ হয় যুক্তিসিদ্ধ এই মন্ত্রের নাম আদর স্নেহ সোহাগ ভালোবাসা। দেখা যায় যে যতবেশি অবাধ্য সে ততবেশি বাধ্য এবং সোহাগের কাঙাল। একটু বুঝিয়ে বললেই সে সেইকাজ করতে প্রস্তুত কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করলে আর ও বেশি অবাধ্য হয়ে পড়ে। হুজুর ও ঠিক সেই সূত্র প্রয়োগ করলেন আর আমি ও বাধ্য ছেলের মত পুনরায় মক্তবখানায় ফিরে এলাম।

আবার ও বিপত্তি শুরু হল নুরু মিয়াকে নিয়ে। হা তে হাওয়াজ আর হা তে হুত্তির ক্ষেত্রে হুত্তি ভালোভাবে উচ্চারন করতে পারলে ও হাওয়াজ এ এসেই ঘটাত বিঘ্ন। হাওয়াজ উচ্চারণ করতে গিয়ে মুখটাকে এমনভাবে হা করত যে মনে হত ওটা বোয়াল মাছের। পাবদা পুঁটি যতক্ষন ঐ গলার মধ্যে না পড়বে ততক্ষন বন্ধ হবে না। যখন দেখা গেল আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছেনা তখন আমরা সকলেই ঐ হা' টির দিকে চেয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতাম। অবশ্য

মাঝে মাঝে হুজুর ও তাতে যোগ দিতেন। - এমনিভাবে কয়দিন আসার পর নুরু মিয়া যখন একপ্রকার নিশ্চিত হল যে তার মস্তিষ্কে পড়ালেখা ধরবার মত স্থান নাই তখন একাই ছেড়ে দিলো। নুরু মিয়ার মক্তব ছেড়ে দেবার পেছনে শুধু যে তার মগজের দোষই বিদ্যমান ছিল এমনটা নয়। বলা চলে আমরাই বাধ্য করেছি। মানুষ ভুল করতে পারে কিন্তু সেই ভুল মমতার বাণী দিয়ে শুধরে না দিয়ে যদি কটাক্ষ করা হয় তবে সে ভুল ভুলই থাকে আর ভুলকারী সে ভুল বারবার করতে থাকে। নুরু মিয়া সেই য মক্তব ছেড়ে দিল আর ওমুখো যায় নাই। আমরা কিন্তু শেষ করে তবেই ছেড়েছি। অবশ্য ছেড়ে দেওয়াতে নবীনরা ও সাহায্য করেছে। সেই কবিতার মতো "এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান "। নতুনদের দলের পাল্লা যখন ক্রমেই ভারী হচ্ছিল তখন হুজুর শুধুমাত্র কোরআন শরীফ হাতে তুলে দিয়েই পাঠদান ইতি টানলেন ঠিক তেমনি ভাবে যেমনি ভাবে মা পাখি বাচ্চাদের একটুখানি ডানা ঝাপটানি শিখিয়েই ছেড়ে দেয়। পাখীর ছানা যেমন ধীরে ধীরে আকাশে উড়তে শেখে আমরা ও ঠিক তেমনি ভাবে একটু একটু করে প্রত্যহ পড়ে শেষকালে খতম পর্যন্ত পৌঁছলাম । খতম এখন ও যে দেইনা তা নয় তবে তা শুধুমাত্র একটি মাস। বাকি এগারটি মাস কোথায় পড়ে থাকে কোরআন।

নুরু মিয়া অবশ্য থেমে থাকেনি। একপথ কন্টকাকির্ণ হলে অন্যপথ অবলম্বন করতে হয়। যার অদম্য ইচ্ছা আল্লাহর একান্ত নিকটে যাবার ! তার ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকতে পারে। পথ কোন না কোন একটা বের হবেই হবে।একদিন সে পথের সন্ধান পেয়ে নুরু মিয়া সে পথেই পা রাখল।– সময়টা বোধকরি কার্তিকের শেষে। সোনালী আমন ধানের নেশাময় গন্ধশেষে ধানের খড়ের এলকোহলের গন্ধ যখন গ্রামময় সমস্ত কৃষকদের নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নবান্নের উৎসব তখনও শুরু হয়নি হবে হবে এমন অবস্থা। কৃষাণ বধুরা এখনও পর্যন্ত কর্মব্যস্ততা শেষ করতে পারেনি। এমনি সময়ে এই শস্যময় দেশে নতুন ধানের নেশাময় গন্ধে কোথা হতে একদল মুসাফির ছুটে এসেছে।আসলো তো আসলো তাও আবার নুরু মিয়ার ঘরে। এ আনন্দ নুরু মিয়া রাখে কোথায়?

মুসাফিরদের গায়ে গেরুয়া বসন,মাথায় জঠধারী লম্বা চুল, মুখে লম্বা দাড়ী। গোফের বাহার এমন যে মুখই দেখা যায় না। কোনদিক দিয়ে খাবার গলধঃকরণ করে তা স্ব-চক্ষে না দেখলে বুঝবার উপায় নাই। বগলে একটা একটা পুটলি। হাতে বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র। কারও কারও উম্মুক্ত পায়ে খড়ম ও শোভা পাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এদেরকে দেখে বুঝবার উপায় নাই এরা কোন ধর্মের। কখনও মনে হয় হিন্দু পুরোহিত আবার কখনো মনে হয় বৌদ্ধ ভিক্ষু। এরা যে মুসলমান তা ঘুনাক্ষরে ও টের পাওয়া যায় না। অবশ্য রাত্রি কালেই চরম মীমাংসা হয়ে গেল এরা কোন ধর্মের। এশার নামাজের ওয়াক্ত শেষে সকলেই বসে গেল ধ্যানে। তারপর উঠে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে এমন জিকির শুরু করল যে মনে হলো বুঝি বা এখনই কুপোকাত হয়ে যায়। নৃত্যের তালে তালে গলার স্বর উঠানামা করতে লাগল কখনও উর্ধ্বমুখী আবার কখনও নিম্নমুখী, নাচানাচি আর ফালাফালিতে পরনের কাপড় ও খসে যাবার উপক্রম, আমাদের বেশ

ভালই লাগছিল এজন্য যে বিটিভিতে আর কষ্ট করে ব্যাটারি খরচ করে নাচ দেখতে হবে না। এখন বিনা পয়সায় দেখা যাচ্ছে তাও আবার স্ব-চক্ষে! তাছাড়া বিশেষ আকর্ষন হচ্ছে জিকির শেষে তবারক। আমন ধানের চাল আর দেশী মুরগী একত্রে সন্ধিকরে যে অপূর্ব স্বাদের খিচূড়ী সৃষ্টি করত তার স্বাদ না নিয়ে কি থাকা যায়? সে খিচূড়ীর কথা মনে পড়লে এখন ও জিভে জল আসে।

এমনি করে মুসাফির দলের প্রধান অবশ্য সকলেই তাকে পীর সাহেব! বলে সম্বোধন করত বেশ কিছু খাদেম জুটিয়ে ফেলল। আজ এ বাড়ী তো কাল ও বাড়ী এমনি ধারায় জিকির আসগার অব্যাহত ভাবে চলতে থাকল।এদের কেউ নামায পড়তনা এরা নাকি মারেখাতের সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যেখানে পৌঁছলে আর নামাজ পড়ার প্রয়োজন পড়েনা। তাদের আত্মা নাকি আল্লাহ্পাকের শানের সাথে মিশে গেছে। তাই তারা দোলে দোলে নামাজ পড়ে অর্থাৎ আখেরী নয় বাতেনী ভাবে (অদৃশ্য ভাবে)। এমনি কথাবার্থা যখন সমস্ত গ্রামে প্রচারিত হতে থাকল তখন সমস্ত গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল আতি সহজে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য নব আগত পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হল আর অন্যদল নামাজ-কালাম আখেরী ধরে (প্রত্যক্ষ) দিনাতিপাত করতে লাগল। এতে বেশ অসুবিধাসূচীত হতে লাগল,কারণ একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়িতে ব্যাস্ত থাকত। আমরা অতশত বুঝিনা দুটো খাবার পেলেই খুশী। তা এখন প্রতিদিনই পাওয়া যাচ্ছেবলে নতুন আগত মুসাফির দলকে ধন্যবাদই দিতাম।

নুরু মিয়ার আনন্দ যেন আর ধরে না। অনেক কাঠখড়ি পুড়িয়ে ও যে কোরআন হেফ্জ করতে পারে নাই তার ঘরে যে এমন ধারায় পীরের আগমন ঘটবে তা সে স্বপ্নে ও কলপনা করতে পারে নাই। পীর তা যে সে পীর নয়, আখেরাতে হিসাব - কিতাব ছাড়াই সরাসরি জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে। তা ছাড়া যাদের আত্মা আল্লাহ্পাকের শানের সাথে মিশে গেছে তাদের আবার ভয় কি? যত ভয় তো যারা নামাজ কালাম পড়ে কোরআন তেলাওয়াত করে তাদের।

এমনি ধারায় বেশ কয়েকবছর কেটে গেল। আমরা তখন পূর্ণ তরুণ।হাইস্কুল পাশ করে কলেজে উঠেছি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম পাড়ায় রাস্তার ওপরে দন্ডায়মান কালের স্বাক্ষী হিসেবে পুরনো কালভার্টটি ছিল তার ওপর বসে কতিপয় বন্ধু মিলে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় সেখানে আগমন ঘটল নুরু মিয়ার। আমাদের সবার মাঝে নুরু মিয়া যখন বসে পড়ল তখন আর আড্ডা জমলনা। সকলেই মৌন ছিলাম। আকস্মাৎ নুরু মিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল – তা বাবা অনিক, হাই স্কুল পাশ করে কলেজে উঠেছ। বেশ ভাল কথা, কিন্তু ধর্ম-কর্ম কিছু কর .....।

কেন চাচা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, কোরআন তেলাওয়াত করি , এগুলো ধর্মের কাজ নয়? – শুধু নামাজ পড়লেই কি সব হয়, জিকির আসগার কিছু কর ....। মুলতঃ নুরু মিয়ার প্রধান

লক্ষ্য ছিল আমাদের দলকে নিজের দলে ভেড়ানো। কোরআনিক মতবাদ অনুসারে স্পষ্টতঃই বুঝতাম ওরা যা করছে তা অন্যায়। বাধা দেব এমন সৎসাহস ও নাই। ওদের দল কম ভারী নয়। তাছাড়া অনেক মুরুব্বী ওদের দলে ভিড়েছে। ওদের বিরুদ্ধে কথা বরতে গেলে মুরুব্বীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। তাই চুপ করে রইলাম। বন্ধু মহলে এমন কথা কেউ বললে ঘায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠত আর সেই ফুঠে উঠা রক্তে পূর্ণ সেদ্ধ করতে না পারলে ও অন্ততঃ অর্ধসেদ্ধ করে ফেলতাম। ক্ষনকাল নিরবতায় কাটল। তারপর নুরু মিয়া পুনরায় বলে উঠল,

–জিকির করলে আত্মা পবিত্র হয়: আল্লাহ্ পাকের শানে পৌঁছা যায়।

– কিন্তু আমি তো জানি, নামাজ ছাড়া আল্লাহ্ পাকের শানে পৌঁছা যায়না। কোরআনেও স্পষ্ট লেখা আছে।

– মানুষের লেখা কোরআনে বিশ্বাস কি?

– তার মানে?

– মানে আবার কি? মানুষেইতো কোরআন ছাপায় তাই না?

– মানুষে ছাপায় তা ঠিক। মুদ্রন যন্ত্রের কল্যানে কোরআনের হাজার হাজার কপি চাপা হয়। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান যদি এই ছাপানো কোরআনের কথা বিশ্বাস করে আপনাদের বাধা কোথায়?

আমার যুক্তির কাছে নুরু মিয়া হার মানল। তাই আর অপেক্ষা না করে উঠে বাড়ীর দিকে চলে গেল। আমরা ও তথায় অবস্থান না করে যার যার ঘরে পদার্পন করলাম।– এমনি করে আর ও বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হল। আকস্মাৎ একদিন খবর পেলাম পার্শ্ববর্তী গ্রামে নদীর ধারে একটা মাজার স্থাপিত হয়েছে। এর নাম দিয়েছে "পাগলা বাবার মাজার"। নুরু মিয়ার কপাল আরও একবার খুলল এইজন্য যে নতুন মাজারের খাদেম সে নিযুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকার পীর হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছে।

নতুন মাজারের কথা শুনে মনে কৌতুহল জাগল। তাছাড়া ইতিপূর্বে এই খানদানে কোন মাজারের নাম গন্ধ ও কেউ কোনকালে পায় নাই। মাজারের নেপথ্যে ইতিহাস জানতে মনটা অস্থির হয়ে উঠল। তাই একদিন অপরাহ্নকালে বৈকালিক ভ্রমনের উদ্দেশ্যে পাশ্বর্বতী গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম যেখানে মাজার স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত গ্রামের একজন মুরব্বীর সাথে কথা বললাম। মুরব্বীর সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে একযুগ আগে যখন আমরা খুবই ছোট ছিলাম ঠিক সে সময়ে কোথা হতে এ অঞ্চলে এক উলঙ্গ পাগলেরআগমন ঘটেছিল। সারাটাদিন গ্রামের সমস্ত মানুষের হাড্ডি জ্বালিয়ে রাত্রিকালে আশ্রয় নিত পরিত্যাক্ত এই নদীর তীরে। পাগলটার অত্যাচারে গ্রামের সমস্ত মানুষের যখন নাভিশ্বাস অবস্থা এমনি সময়ে হঠাৎ করেই আর পাগলটার সন্ধান পাওয়া গেল না। কতিপয় যুবক খোঁজ নিয়ে দেখতে পেল যে নদীর তীরে যে উচুঁ ঢিবি আছে তার পার্শ্বে পাগলটি মরে পড়ে আছে। গ্রামের সমস্ত লোকের অত্যাচারের অবসান ঘটল। তখন কয়েকজন মিলে উচুঁ ঢিবিটার ওপরেই পাগলটার

শেষ আবাসস্থল নির্ধারন করল যা এখন মাজার বলে বিবেচিত। মুরব্বীর কথা অবশ্য বিশ্বাস হবার মত। এর নৈপথ্যে অবশ্য যুক্তি ও আছে। মাধ্যমিক পরিক্ষায় পাশ করার পর মামার চাকরিস্থল বার আউলিয়ার দেশে ভ্রমন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । সেখানে গিয়ে দেখতে পেলাম আউলিয়া বারজন কিন্তু মাজার সংখ্যা বার নয়, বারশ নয়, বার সহস্রের ও অধিক আর সেই সমস্ত মাজারে শোভা পাচ্ছে শালু কাপড়। অজস্র মানুষের হাঁক ডাকের শব্দে পরিবেশটা মুখরিত। নুরু মিয়াদের মতই লম্বা দাড়ীওয়ালা জটাধারী পীররা সেখানে জিকির অসগরে মত্ত। নামাজ রোযার ধার এরা ধারেনা। এত শুনেছিলাম যে একশ্রেনীর যুবক-যুবতীরা মাজারকে স্বাক্ষী রেখে মালাবদল করে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রশ্ন জেগেছিল আউলিয়ার সংখ্যা বারজন হলে বার সহস্রের অধিক মাজার আসলো কোথা থেকে। আজ তার বাস্তবতা খুঁজে পেলাম। মাজারের ইতিহাস শোনা শেষে বাড়িতে ফিরে আসছিলাম পথের মধ্যে দেখা মিলল সহপাঠি সুজনের সাথে। সুজনের কাছে অগ্রিম দাওয়াত পেলাম যে আগামী বৃহঃস্পতিবার কর্তৃপক্ষ পাগলাবাবার ওরশ উপলক্ষে মেলার আয়োজন করেছে। সুজন এও বলল যে আমি সেখানে উপস্থিত হলে বেশ মজা হবে। আমি উপস্থিত হতে পারবনা বলে মর্মে নোটিশ জারী করলে বন্ধুটি বেশ মনক্ষুন্ন হলো। অগত্যা উপস্থিত হব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনের দু'দিন পূর্ব হতেই আকর্ষাৎ মেঘের কি যেন হলো। মেঘের আঁখি হতে অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। এ কান্নার যেন শেষ নেই– এতটুক বিরান নেই। অজস্র ধারায় বৃষ্টি ঝরতে ঝরতে খালবিল একেবারে পূর্ণ হয়ে গেল। শক্ত মাটি সিক্ত হয়ে এমন আকৃতি ধারন করল যে মাটির ওপর পা ফেলাই দায় হয়ে পড়ল। পা ফেললেই মাটি হাঁটু পর্যন্ত গিলে ফেলে। পা তুললে দেখাযায় যে মেঘের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে না পেরে মাটি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে আর সেই সংগ্রামের চিহ্ন স্বরুপ পায়ের সাথে এমন ভাবে আটকে যেতে লাগল যে ছাড়াতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। অগত্যা কোন উপায়ান্তর না দেখে নৌকা যোগে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা বেশ কয়েকজন তরুন ছোট একখানি নৌকা নিয়ে মাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। টিপটিপ বৃষ্টি তখনও থামেনি। ছাতা ছাড়া বের হবার উপায় নাই। প্রয়োজনীয় বস্তু সংগে নিলাম। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম।মাজার ঘাটে পৌঁছে দেখি সুজন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়ে একেবারে মাজারের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। বৃষ্টির কারণেই হোক আর যে কোন কারণে হোক দেখলাম ভীড় তেমনটা নাই। দু'চারজন জটাধারী ভক্ত আর আমাদের মত কিছু উৎসুক দর্শক ছাড়া বিশেষ কেউ নাই। নুরু মিয়া আমাদের সমাদর করে বসাল। বসার ইচ্ছা আমার ছিল না কারণ মাজারের মধ্যে উৎকোট গন্ধ এমনভাবে বের হচ্ছে মনে হল এখনই বুঝি নাসারন্ধ্র ফুটো হয়ে যাবে। গন্ধটা কিসের তা জানার নিমিত্তে আগ্রহ প্রকাশ করলে জানতে পারলাম যে ভক্তরা সিদ্ধি (গাঁজা) সেবন করছে এবং দু'একজন এখনও করছে। সিদ্ধি বস্তুটা যে সেবন করছে তা তাদের চেহারা দেখেই বোঝা

যাচ্ছে। আমি অনভিজ্ঞ বলেই বুঝি বুঝতে দেরী হল। আমার হাব-ভাব দেখে সমবেত অনেকেই একচোট হেসে নিল। হয়তো বলত "কোথাকার কোন গাধা এসেছে মাজার দর্শনে " কিন্তু পারলনা এইজন্য যে আমি খাদেমরুপী পীর সাহেবের ! খাস মেহমান।

সিদ্ধি সেবন শেষে ভক্তবৃন্দ উঠে দাড়াল। তারপর শুরু হল বাদ্যযন্ত্রের টুংটাং আওয়াজ।সুরের মূর্ছনায় আর গন্ধিকার শক্তিমাত্রায় ভক্তরা বুঝি নতুন যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে। একযোগে মাথা দুলিয়ে শুরু করে দিল আল্লাহু আল্লাহু জিকির। জিকির চল্ছে তো চল্ছেই যেন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আর থামবে না। যখন দেখলাম থামার কোন লক্ষন নাই তখন সুজনের সাথে তার বাড়ীতে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম আমার সাঙ্গোপাঙ্গো যা ছিল তারা আমার অনুপস্থিতির সুযোগে সিদ্ধি সেবন করেছে আর সিদ্ধির গুনে ওদের সাথে নাচা-নাচিতে শরীক হয়েছে। বন্ধু সম্পর্কীয় দু'জনকে কষে থাপ্পড় মারতেই চেতনা ফিরে পেল কিন্তু বাকীগুলোর অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না । যেভাবে নাচতে ছিল ঠিক সেভাবেই নাচা-নাচি অব্যহত রাখল।অগত্যা যাদের চৈতন্য দয় হয়েছিল,তাদেরকে সংগে নিয়ে ফিরে এলাম।

বাড়ীতে ফিরে যখন ঘুমোতে গেলাম তখন প্রায় মধ্যরাত্রী। কিন্তু ঘুম চোখে আসল না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল আজকের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি। মনের মাঝে বার বার প্রশ্ন এসে দোলা দিতে লাগল আর কত দল – উপদল আর পাতিদলে বিভক্ত হবে মুসলিম সমাজ। তওহীদের উপর যদি বিশ্বাসই থাকবে তবে এসব কিসের নমুনা?

পরদিন সন্ধ্যাকালীন সময়ে বৃষ্টি থেমে গেল। সারাদিন কুঁড়ের মত বসে থেকে হাত পা যেন ব্যাথা হয়ে গেছে। সেগুলোকে এখন একটু নাড়ানো চাই। হোক এক হাটু কাদা একটু ঘুরে আসা যাক্।

এক হাঁটু কাদা পেরিয়ে কালভার্টটায় এসে উপস্থিত হলাম। এসে দেখলাম বেশ কয়েকজন সেখানে খোশগল্পে মগ্ন। বেশ খানিকটা গাঢ় অন্ধকার ছিল তাই আমার আগমন কেউ খেয়াল করেনি। সেখানে কে কে আছে তাও জানিনা। সবার অলক্ষ্যে পাকা পোলের ওপর চুপ করে বসে পড়লাম। কণ্ঠের আভাসে বূঝতে পারলাম এদলে নুরু মিয়া আছে তাই আগ্রহের মাত্রা একটু বাড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম ওদের আলোচনা। আলোচনাটা অনেক্ষন থেকেই চলছিল। বোধকরি আমি মাঝামাঝি পর্যায়ে এসেছি। আগে কি আলোচনা হয়েছে শুনি নাই। মাঝখানে শুনতে পেলাম নুরু মিয়া বলছে– দেখিস্ কবরে আমার লাশ পচবেনা। নুরু মিয়া মুখ হা করে আর ও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঐ যে হা এ হাওয়াজ,আর হা তে হুত্তির সময় যেভাবে মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই আমি মুখটা বন্ধ করে দিলাম। লাশ পচবেনা কথাটা শোনামাত্র আমি বলে উঠলাম – তাহলে চাচা, মাটি কাটার সময় এত কঙ্কাল আসে কোথা থেকে?

আমার গলার আওয়াজ পেয়ে নুরু মিয়া একেবারে চুপসে গেল। অন্য কোন কথা না পেয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল– তুমি , তুমি আবার কখন এলে ? এইতো চাচা, কথার মাঝে। নুরু মিয়ার মুখ হতে আর কোন কথা বের হলনা। যখন দেখলাম সকলেই নিরব, তখন পুনরায় বললাম –একটা কথা বলি চাচা। –বল। ফাতিমা (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেছিলেন আর তাঁকে দাফন করার সময় কোন এক সাহাবী বলেছিলেন– " হে মাটি রাসুলের (সাঃ) কন্যাকে দাফন করে গেলাম তাঁকে একটু দেখো"তখন মাটির জবান খুলে গিয়েছিল। মাটি কি বলেছিলো জানেন চাচা....? না । মাটি বলেছিল, রাসুলের (সাঃ) কন্যাকে চিনি না আমি চিনি পূন্য। আমার কথা শুনে নুরু মিয়া উঠে দাঁড়াল – উদ্দেশ্য চলে যাওয়া। কয়েক কদম গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল তোমরা বাপু , দু'এক কদম লেখা পড়া শিখে মুরব্বীদের মান্যই করনা। সে কি চাচা,যা সত্য তাই বললাম। সেদিনের মত আর আলোচনা হলনা। এদের সভা পন্ড হবে বলে জানলে আমি কথাই বলতাম না। নিজের ওপর নিজেরই অভিমান হল। আমার স্বভাবটাই যেন এমন যেখানে সেখানে পা চালাতে দ্বিধাবোধ করিনা। অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে নাই এটা জানার পরে ও কেন যে বলতে যাই তা বুঝিনা। সকলেই উঠে চলে যাবার পর আমি ও চলে এলাম।

আমার কথায় নুরু মিয়া থম্‌কে যায়নি। নিজে যেহেতু পীরের সম্মান পেয়েছে আর পীরের কর্মপন্থা গুনে দিনের পর দিন মুরিদের সংখ্যা বাড়িয়েই চলল। অতি সহজে জান্নাত পেতে কে–না চায় ? তাই অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজে নুরু মিয়ার মত স্বার্থলোভী ধর্মান্ধ পীরের দাপটেই মুরীদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলল। এমনি করে বছর দুই ইসলামের সেবা করে নুরু মিয়া একদিন পরপারে যাত্রা করল।

নুরু মিয়াকে দাফন করে এলাম । জানিনা তার লাশ কবরে অক্ষত আছে কি না? অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে অবশ্য ময়না তদন্তে বোঝা যেত, কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে তা আর দেখা সম্ভব হল না। যেভাবে আছে থাক্ আর দেখে লাভ কি? আর মাজার ? তা এখনো আছে। যদি নাই থাকবে, তবে দিনে দিনে এত মাজারের সংখ্যা বাড়ছে কিভাবে ?

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি, পোঃ + গ্রামঃ নিতাই নগর, থানাঃ বড়ইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর